স্কুল ভবন মেঘনাগর্ভে : ক্লাস হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে

● ছোটন সাহা

কিছুদিন আগেও পাকা ভবনের শ্রেণিকক্ষে বসে ক্লাস করেছিল শিক্ষার্থীরা। বৃষ্টি বা তাতানো রোদে কোনো ভয়ই ছিল না। কিন্তু পাল্টে গেছে সে দৃশ্যপট। এখন রোদ আর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে তারা। প্রতিদিনই কেউ না কেউ অসুস্থ হচ্ছে। এ চিত্র ভোলা সদর উপজেলার মূল ভূখ- থেকে বিচ্ছিন্ন রাজাপুর ইউনিয়নের ভাঙনকবলিত রামদাসপুরের রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের।

এলাকার শিক্ষার মানোন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করলেও ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী স্কুলটি এখন প্রমত্তা মেঘনার করাল গ্রাসে বিলীন। টিকে আছে একটি মাত্র টিনশেড ভবন। সেখানে এবং পাশের মাদ্রাসার একটি কক্ষে গাদাগাদি করে কয়েকটি শ্রেণির পাঠদান সম্ভব হলেও বাকি শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে হচ্ছে। কিছুদিন পর এ ভবনটিও মেঘনায় হারিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

ঐতিহ্যবাহী যশোর সরকারি গণগ্রন্থাগার বই আছে, ভবন আছে, পাঠক নেই

● মামুন রহমান

বই আছে, আছে আধুনিক ভবনও। কিন্তু পাঠক নেই যশোর সরকারি গণগ্রন্থাগারে। যে লক্ষ্য নিয়ে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, বাস্তবে তা কোনো কাজে আসছে না। লাইব্রেরি ভবনটি শহর থেকে বেশ দূরে নির্মাণ করায় সেখানে পাঠকরা যাচ্ছেন না। এ সুযোগে লাইব্রেরি এলাকায় আস্তানা গেড়েছে নেশাখোর আর ছিনতাইকারীরা। সবকিছু মিলে যশোরের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক লাইব্রেরি তার অতীত গৌরব হারাচ্ছে।

যশোর পাবলিক লাইব্রেরির সাবেক সম্পাদক এবং যশোর শিক্ষা বোর্ডের সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রফেসর আমিরুল আলম খান জানান, 'ভারতীয়দের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করাতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট অনুমোদন করে। ১৮৫৪ সালে তারা ভারতীয় উপমহাদেশে ৪টি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে। এরই একটি হচ্ছে যশোর পাবলিক লাইব্রেরি। বাকি ৩টি অনেক আগেই অস্তিত্ব হারিয়েছে। এ লাইব্রেরিতে এমন কিছু দুর্লভ সংগ্রহ আছে যা বিশ্বের আর কোথাও নেই। এছাড়া রয়েছে বহু মূল্যবান পা-ুলিপি। তালপাতায় লেখা পা-ুলিপিও আছে বেশকিছু। এ লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। লাইব্রেরিটির আদি অবস্থান ছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র টাউন হল ময়দানের পাশে যশোর ইনস্টিটিউট ভবনে। এ কারণে পাবলিক লাইব্রেরির জন্য পৃথক ভবনের কথা ভাবা হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। বর্তমান লাইব্রেরিয়ান আবদুল কুদ্দুস জানান, প্রয়োজনের তাগিদে সরকার শহরের নাজির শংকরপুর এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরির জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ করে। ২০১১ সালে পাবলিক লাইব্রেরি নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়। তবে শহর থেকে দূরে হওয়ায় এখন আর তেমন পাঠক এখানে আসে না। জনকোলাহল না থাকায় আশপাশের নেশাখোর ছাড়াও সমাজবিরোধীরা সন্ধ্যার পর এখানে আস্তানা গাড়ে। লাইব্রেরিতে কর্মরতরা ভয়ে ভয়ে অফিস করেন। নিরাপত্তা না থাকায় তারা সন্ত্রাসীদের কোনো কাজে বাধাও দিতে পারেন না।

পায়রা পোষা শখ থেকে আয়ের উৎস

● আবু জাফর সাবু

শখ করে কবুতর পুষতেন। বাড়ির ছাদে গড়ে তুলেছিলেন 'বাকবাকুম পিজিয়ন ফার্ম'। গাইবান্ধার সাংবাদিক খুরশিদ বিন আতা খসরু এবং তার স্ত্রী সাহারা খুরশিদ পান্নার এই কবুতরের খামারটি এখন তাদের আয়ের অন্যতম উৎস। এই সুখী দম্পতির অন্যতম শখ ছিল আকাশে গিরিবাজ পায়রার নান্দনিক উড়াল, ডিগবাজি, নোটন পায়রার নেচে নেচে ওড়া উপভোগ, পোর্টার বল এবং বুলু পোর্টারের শ্রুতিমধুর বাকবাকুম ডাক শোনা। কবুতরের ব্যবসা নয়, শুধু বিনোদনের উদ্দেশ্যেই গাইবান্ধা শহরের ব্রিজ রোডে তাদের তিনতলা বাড়ির ছাদে গড়ে তুলেছিলেন কবুতরের এই খামারটি। অথচ এটাই এখন তার আয়ের এক বড় উৎস। বিচিত্রবর্ণের ও উন্নত প্রজাতির নানা কবুতরের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছে খামারটি। এখন সেখানে রয়েছে ৭টি ভিন্ন জাতের অসংখ্য কবুতর। রয়েছে পেখমওয়ালা সাদা লাক্কা, পায়ে ঘন পালকওয়ালা বুলু পোর্টার, যার এক জোড়ার দামই ৬ হাজার টাকার বেশি। এছাড়া রয়েছে দৃষ্টিনন্দন নান, সুদৃশ্য ঘিয়া চুল্লি, দ্রুতগতির ধূসর ও কালো রঙের মিশেল রেসার হোমার ইত্যাদি। পাইকার ও শৌখিন পায়রা সংগ্রাহকরা এই খামার থেকে কবুতর কিনে নিয়ে যান। তাদের দেখে এলাকার অনেকেই এখন পায়রা পোষায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

ঋণে দিশাহারা খুলনা-বাগেরহাটের ৫ হাজার পানচাষি

● শুভ্র শচীন

আষাঢ়-ভাদ্র মাসে উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টিপাত হয়নি। ফলে খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় প্রায় ৫ হাজার পানচাষি ব্যাপকভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে এখন দিশাহারা। পানচাষিরা জানান, এবার আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বৃষ্টিপাত হয়নি বলে পানের আকার ছোট হয়েছে। আগস্ট মাসেও বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম। পশ্চিম বাহিরদিয়া গ্রামের পানচাষি আবদুল ওহাব শেখ জানান, এবার তার ১৮ কাঠা জমিতে পানের উৎপাদন খরচ ২০ হাজার টাকা হলেও তিনি এ পর্যন্ত মাত্র ৮ হাজার টাকার পান বিক্রি করেছেন। বরজের পানের আকার বড় না হওয়ায় দাম অনেক কম। কামটা গ্রামের মিজান শেখ জানান, বরজে প্রতি ঘণ্টায় শ্রমিকের মজুরি দিতে হয় ৫০ টাকা। ১শ পান বিক্রি হচ্ছে প্রকারভেদে ১০ থেকে ১৫ টাকায়, যেখানে এ পরিমাণ পানের উৎপাদন খরচ ১৮ টাকা। রূপসা উপজেলার দেবীপুর এলাকার চাষি পবিত্র দাশ জানান, ঘাটভোগ, মৌভোগ, গিলাতলা, তালতলা ও নলগাঁ গ্রামের পানচাষিরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। মানসা গ্রামের পানচাষি ধ্রুব সাহা জানান, তিনি কৃষি ব্যাংক থেকে ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন। বাজার মন্দা হওয়ায় তার পক্ষে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না।

ফকিরহাট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোতাহার হোসেন জানান, উপজেলার বাহিরদিয়া, মানসা, পিলজঙ্গ, পাগলা, মৌভোগ, জাড়িয়া, কামটা, কাঁঠালতলা ও নলধা গ্রামে ৪২৫ হেক্টর জমিতে পানের আবাদ হয়েছে। চালতা ফুলি, মোহন আলী ও কদম ফুলি জাতের পান উৎপাদন হচ্ছে এখানে। বছরে এখানে ২ হাজার ৪৪৫ মেট্রিক টন পান উৎপন্ন হয়। এখানকার পান সৌদি আরব ও পাকিস্তানে রফতানি হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গাছ মরছে আবর্জনায়

● সীমান্ত খোকন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার পৈরতলা, বর্ডার বাজার ও শেরপুর এলাকায় কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের পাশে খোলা জায়গায় পৌরসভার ময়লা-আবর্জনা ফেলায় আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ফলে ওই এলাকার বড় বড় গাছ মরে যাচ্ছে। সেখানকার অধিবাসীরাও আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি রোগে ভুগছেন। এ রাস্তার আশপাশের

ব্যবসায়ীরাও দুর্গন্ধের কারণে স্বস্তিতে ব্যবসা করতে পারছেন না। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, পৈরতলা ব্রিজ থেকে শেরপুর পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে আবর্জনা। সেখান দিয়ে হেঁটে গেলে মানুষের শ্বাসকষ্ট হয়। এলাকাবাসী জানায়, মহাসড়কের এই অংশে আগে অন্তত ৫০টি বড় গাছ থাকলেও সেই গাছ মরে এখন টিকে আছে মাত্র ১০-১২টি। পৈরতলা গ্রামের আলমগীর বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা বিশাল এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এর ময়লা-আবর্জনা ফেলার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই বলে পৌরসভার কর্মীরা যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলে পরিবেশ নষ্ট করছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন বিভাগের সহকারী সংরক্ষক এনামুল হক বলেন, গাছে নিয়মিত বিষাক্ত মাটির ছোঁয়া ও বিষাক্ত হাওয়া লাগায় ওই এলাকার গাছগুলো ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার মেয়র মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, 'শহরের আবর্জনা ফেলার জন্য সরকার থেকে আমাদের নির্দিষ্ট কোনো জায়গা দেয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই আমরা যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলছি। তবে একটি বড় ডাম্পিং স্পটের জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছি।'

শখের গো-খামারে দিনবদল

● সৌমিত্র শীল চন্দন

মূলত শখের বসেই তারা দুজন গরু পালতে শুরু করেছিলেন। এই শখই তাদের বদলে দিয়েছে জীবন। গো-খামার করে তারা আজ হয়ে উঠেছেন অনেকেরই প্রেরণার উৎস। এ দুজন হলেন রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার নারুয়া গ্রামের মঞ্জুরুল ইসলাম এবং নবাবপুর ইউনিয়নের দিলালপুর গ্রামের শিউলি মোদক। ইতিমধ্যে মঞ্জুরুল ইসলাম একজন সফল দুগ্ধ খামারি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তার গোয়াল ভরা গরু, ক্ষেত ভরা ঘাস, সেই সঙ্গে রয়েছে গোবরের বায়োগ্যাস। জানালেন, এক সময় তিনি নারুয়া বাজারে ভুসিমালের ব্যবসা করতেন। ১৯৯৭ সালে শখের বশে ছোট একটি গাভী কেনেন। এখন তার খামারে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩০টি গাভী, যা থেকে প্রতিদিন ৩শ লিটার দুধ পাওয়া যায়। ঘাসের চাষ করছেন ১০ বিঘা জমিতে। খামারের গোবর দিয়ে তৈরি বায়োগ্যাস দিয়ে ছয় সদস্যের পরিবারের রান্নার কাজ চলে। বর্তমানে তার মাসিক আয় দেড় লাখ টাকা। অন্যদিকে বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের দিলালপুর গ্রামের গোবিন্দ কুমার মোদকের স্ত্রী শিউলি রানী মোদক বালিয়াকান্দি উপজেলার তৎকালীন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. কানাই লালের অনুপ্রেরণায় গো-খামার গড়ে তোলেন। বর্তমানে তার খামারে গাভীর সংখ্যা ২২টি। প্রতিদিন প্রায় ২শ লিটার দুধ উৎপাদন হয় তার খামারে। বালিয়াকান্দি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মনিরুল ইসলাম জানান, বালিয়াকান্দি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহযোগিতা ও পরামর্শে গো-খামার করে মঞ্জুরুল ইসলাম ও শিউলি মোদক সফলতার মুখ দেখেছেন। ■